Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-IV, July 2024, Page No.202-209
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বিশ্বায়নের যাপন ও সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কড়িখেলা’ উপন্যাস

জয়শ্রী দত্ত চৌধুরী
গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, আসাম, ভারত

Abstract:

Globalization is the name of the political and economic system that allows trade to operate worldwide without hindrance. Globalization means the free flow of goods and capital across the world. This globalization has radically changed the cultural society of the entire India, and from this point of change, many differences are observed between the way previous generations grew up and the way the post-globalization generation is growing up. The extensive impact that globalization has had on Bengali life has naturally been reflected in contemporary literature in various ways. In Sangeeta Bandyopadhyay's novel 'Korikhela,' the various aspects of globalization's lifestyle, centered around contemporary women, are the subject of discussion here.

Keywords: Globalization, Marital relationships, Food culture, Women's values, Sense of beauty.

বিশ্বায়ন (Globalization) বিষয়টিকে নিয়ে গত বেশ কিছু সময় ধরে নানা অবস্থান থেকে নানান ধরনের চর্চা হয়েছে। বিদ্যাচর্চার পরিসর থেকে শুরু করে প্রায়োগিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্র, সর্বত্রই বিশ্বায়নের পক্ষে বিপক্ষে নানান মত তৈরি হয়েছে। বিশ্বায়নের ইতিহাস এবং প্রভাব সম্পর্কে সমাজে ভিন্ন-ভিন্ন মত আছে।

“এ সময় আমরা নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনে বিশ্বায়নের যে প্রভাব দেখতে পাচ্ছি সেটি একটি নির্দিষ্ট সময় পরবর্তী বিশ্বায়নের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও তার ফল। প্রথমত,

বিশ্বায়ন প্রাথমিক ভাবে একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, পুঁজির এক বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ। বিশেষত ব্রেটন উড প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন, বিশ্বব্যাঙ্ক (World Bank), আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (IMF), বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) প্রভৃতি পুঁজিবাদীদের স্বার্থবাহী বিভিন্ন সংগঠনগুলি ‘উন্নয়নশীল’ এবং ‘অনুন্নত’ দেশগুলিকে চাপ দিয়ে সেই দেশগুলিতে বাজার অর্থনীতির (Market Economy) বিকাশের এবং উদারীকরণের নামে সেই দেশের বাজারকে বিশ্বপুঁজির কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে পুঁজির এক নির্দিষ্ট ধরণের বিকাশকে হাজির করেছে। একেই আজকের পৃথিবী বিশ্বায়ন বলে অভিহিত করছে। অর্থনৈতিক-সামাজিকভাবে এর সাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে সংক্ষেপে এভাবে বর্ণনা করা যায়।

(১) আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজির (Finance Capital) সার্বিক বিনিয়োগ

(২) শেয়ার বাজারে ফাটকা পুঁজির বিনিয়োগ।
(৩) পেট্রো ডলারের রমরমা।
(৪) তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক বিস্ফার।
(৫) গণমাধ্যমের ব্যাপক বিকাশ।
(৬) ফোর্ড-উত্তর উৎপাদন ব্যবস্থা।
(৭) জাতি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব হ্রাস”[১]

এছাড়াও ভারতবর্ষের মত রাষ্ট্রগুলিতে উদারীকরণ, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যক্তি মালিকানার হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য করা, দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারকে বিশ্বপুঁজির জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া, অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতা থেকে রাষ্ট্রের হাত গুটিয়ে নেওয়া - এ বিষয়গুলি বিশ শতকের সাতের দশক পরবর্তী বিশ্বায়নের বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

বিশ্বায়নের যেমন কিছু অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায়, তেমনভাবে বিশ্বায়নের মতাদর্শ, সংস্কৃতিকেও চিহ্নিত করা যায়। এ নিয়ে বিভিন্ন চর্চা হয়েছে, হচ্ছে এবং বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক এগুলিকে চিহ্নিত করার চেষ্টাও করেছেন।

বিশ্বায়ন এমন এক মতাদর্শের নির্মাণ করতে চায় যা পৃথিবীব্যপী কর্পোরেটদের উদ্দেশ্য ও আকাঙ্খাকে প্রয়োগ করে। এই মতাদর্শ নয়া সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের মাধ্যমে জাতিরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে খর্ব করার পক্ষে যৌক্তিকতা গড়ে তোলে, জনগণের জন্য সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা প্রদানকে নিরুৎসাহিত করে, জনসাধারণের স্বার্থে পরিচালিত, রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক প্রকল্প (welfare activity) গুলিকে বন্ধ করার পক্ষে মত গড়ে তোলে।

বিশ্বায়নের সংস্কৃতি নিয়েও বিভিন্ন সমাজ-সাহিত্য তাত্ত্বিকরা আলোচনা করেছেন। Edward Said বিশ্বায়নের সংস্কৃতিকে ভোগ্যপণ্যের সংস্কৃতি (consumer culture) বলে বর্ণনা করেছেন। বদ্রিলারের মতে এই ভোগ্যপণ্যের সংস্কৃতি এমনভাবে জনমানসে প্রোথিত করা হয়, যার মধ্যে দিয়ে বিশ্বপুঁজির সহায়ক প্রতীকগুলি সম্পর্কে জনমানসে একধরণের মোহ তৈরি হয়। কোনো বস্তুর গুরুত্ব বিচার করা হয় তার উপযোগিতা দিয়ে নয়, বস্তুটির উৎপাদক প্রতিষ্ঠানটির ব্র্যান্ডনামের মধ্যে দিয়ে। অর্থাৎ বস্তুর চিহ্নগত পরিচিতি ছাড়িয়ে বস্তুটির ওপর একধরণের প্রতীকী তাৎপর্য আরোপ করা হয়, যে প্রতীকগুলি নির্দিষ্ট ধরণের সামাজিক তাৎপর্য, সামাজিক অর্থ বহন করে, যে তাৎপর্য শেষ অর্থে বিশ্বায়নের অর্থনীতিকেই পুষ্ট করে।

জোনাথন জেভিয়ার ইন্ডা ও রেনাতো রোসালডোর আলোচনায় বিশ্বায়নের কতগুলি বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই যেমন –

> ‘‘এক, a cultural flow - of capital, people, commodities, images and ideologies........spaces of the globe are becoming increasingly interwined.
>
> দুই, ...Increasingly global standardization of cultural goods, tastes, and practices.
>
> তিন, disembedded institutions, linking local practices with globalized social relations. (Giddens)
>
> চার, ...Radically pulled culture apart from place-deterritorialization of culture.

> পাঁচ, Local culture, in other words, is meeting with submersion from mass-produced emissions of commercial broadcasting.”[২]

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, বিশ্বায়নের ফলে পরিবর্তন ঘটছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যার সঙ্গে যুক্ত থাকছে রাজনীতি। এরই হাত ধরে আসছে প্রযুক্তি, যোগাযোগ, গণমাধ্যম। অর্থনৈতিক ভিত্তিতে এই পরিবর্তন অভিঘাত সৃষ্টি করছে সমাজ-পরিবার ধর্ম-সংস্কার ইত্যাদির উপর। এই বিষয়টাকে আরেকটু বিশদ করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

বিশ্বায়নের ফলে একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে, প্রযুক্তি ও জ্ঞানভিত্তিক কাজের গুরুত্ব বেড়েছে, তাছাড়া শহরায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি অন্যদিকে ধনী - গরিব বৈষম্য ও বেড়েছে। বিভিন্ন দেশগুলি ক্রমশই পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে নানা সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটছে এবং এর ভিত্তিতে পুঁজি, মানুষ, পণ্য, মতাদর্শ সব এক হয়ে যাচ্ছে। গ্লোবাল সংস্কৃতির প্রসার ঘটায় আমাদের প্রচলিত অভ্যাস, রুচি, চলন-ধরন, নিয়ম নীতি এক কথায় স্থানীয় সংস্কৃতির ভিন্নতা ও নিজস্বতার উপর প্রভাব ফেলছে বিদেশি সংস্কৃতি। যেমন বিশ্বায়ন আমাদের খাদ্যাভাসে পরিবর্তন এনেছে। পুঁজি বিনিয়োগকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দেশের খাবার এখন সহজলভ্য, পশ্চিমা ফাস্টফুড চেইনগুলি বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এবং এতে স্থানীয় খাদ্যাভ্যাস প্রভাবিত হচ্ছে। অন্যদিকে হলিউড মুভি, পশ্চিমা সংগীত, ইউটিউব এবং অন্যান্য স্ট্রিমিং সার্ভিস এর মাধ্যমে মানুষ সহজেই গ্লোবাল কন্টেন্ট এক্সেস করতে পারছে ফলে একভাবে পারিবারিক সম্পর্কগুলিতে ভাঙ্গন ও দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। গ্লোবাল ফ্যাশন ট্র্যান্ডগুলো স্থানীয় ফ্যাশনকে প্রতিস্থাপন করছে। নতুন প্রজন্ম স্থানীয় ভাষা শেখার আগ্রহ হারাচ্ছে এবং ক্রমে আন্তর্জাতিক ভাষার দিকে ঝুঁকছে। আবার, বিশ্বায়িত পৃথিবীতে শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে মেয়েদের আর্থিক স্বাধীনতার পাশাপাশি আত্মবিশ্বাস বাড়ছে এবং নিজেদের অধিকার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছে।

বিশ্বায়নের ফলে ঘটে যাওয়া এই পরিবর্তনগুলো কীভাবে সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কড়িখেলা’ উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে তা আলোচনা করা হচ্ছে বিশ্বায়নের দর্শনের কয়েকটি প্রকাশকে কেন্দ্র করে।

১) নির্বাচিত উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কের পরিবর্তন: বিশ্বায়নকে কেন্দ্র করে বিভিন্নভাবে পারিবারিক সম্পর্কের উপর প্রভাব পড়ছে। কর্মব্যস্ততার ফলে আজকাল সম্পর্কের প্রতি সময় ও মনোযোগের ব্যাঘাত ঘটছে এবং এর ফলে নিজেদের মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে। অন্যদিকে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র এবং স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কারণে পারিবারিক দায়িত্ব এবং দায়বদ্ধতার অনুভূতি কমে যাচ্ছে। সর্বোপরি, সমানাধিকারের জায়গা থেকে দাম্পত্য সম্পর্কে আর তথাকথিত ‘মেনে নেওয়া, মানিয়ে নেওয়া’র বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে দাম্পত্য সম্পর্কগুলো ভাঙতে শুরু করল আর এই ভাঙ্গনটাই স্বাভাবিক হয়ে উঠল।

সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কড়িখেলা’ উপন্যাস অবলম্বনে দেখা যায় –

> “ধুস! এই নাকি প্রাক্তন? নাকের ডগায় বসে আছে আদিত্যর! আহা, কি ভালো ডিভোর্সই না হয়েছে আদিত্য আর পরমার! ডিভোর্স হয়ে গেছে, কিন্তু পরমা শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে ছেলে নিয়ে থেকে গেছে আদিত্যর সল্টলেকের পৈত্রিক বাড়িতেই! শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে সে যেমন পুত্রবধু

> তেমনি রয়ে গেছে... আর আদিত্য বেরিয়ে এসে বিয়ে করে ফ্ল্যাট কিনে তাকে নিয়ে থাকছে। অথচ সকাল-বিকেল তার সল্টলেকের বাড়িতে যাওয়া চাই।”[৩]

বিবাহকে একসময় অবিচ্ছেদ্য বন্ধন বলে মনে করা হতো। আজকাল দাম্পত্য সম্পর্কগুলোর কোন স্থায়িত্ব নেই অর্থাৎ সম্পর্কগুলো খুব ঠুনকো হয়ে উঠেছে। একটা সম্পর্ক ভেঙে গিয়ে নতুন সম্পর্কে জড়াচ্ছে, আবার আগের সম্পর্কে কোথাও যেন একটা টান থেকে যাচ্ছে। উপন্যাসের চরিত্র আদিত্য-পরামার ডিভোর্স হয়ে গেলেও পরমা আদিত্যের পৈত্রিক বাড়িতেই তার মা-বাবা-ছেলেকে নিয়ে থাকে। অন্যদিকে আদিত্য ফ্ল্যাট কিনে নতুন স্ত্রী শর্মিলাকে নিয়ে থাকলেও প্রতিনিয়ত বাড়িতে যাতায়াত করছে। একটি সম্পর্কের মধ্যে পুরনো টান বা সম্পর্কের ছাপ থেকে যাওয়ায় খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রতিনিয়ত সংশয়, অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে শর্মিলার মন-মানসিকতায় এবং এর প্রকাশ দেখা যাচ্ছে তার ব্যবহারেও। ফলে নতুন সংসারেও বিঘ্ন ঘটছে।

বৈবাহিক সম্পর্ক যে আজকাল কতটা ঠুনকো হয়ে উঠেছে তার উদাহরণ:

> “সোহিনী ওই ঘটনার পর দেন এন্ড দেয়ার শ্বশুরবাড়ির ছেড়ে দেওয়ার কথাই ভেবেছিল। দেড় মাসের বিয়ে, নাথিং। এই যুগে এরকম বিয়ে মানুষের জীবনে কোন দাগই রাখেনা। এই তো তার পিসতুতো দিদি তৃণারই বিয়ের চার মাসের মাথায় ডাইবোর্স ফাইল হয়। মানুষের যেমন পক্স বা টাইফয়েড হয়, চামড়ার দাগ কদিনের মধ্যেই সেরে যায় সেরকমই এমন বিয়ে থেকে লোকে মুক্তি পেয়ে আবার স্বাভাবিক জীবন ফিরে পায়। তার পরিবারে এসব নিয়ে কানাকানিও নেই। তৃণা আবার বিয়ে করে সুখে আছে। যাকে বিয়ে করেছে তারও ওরকম একটা খুচরো বিয়ে ছিল।”[৪]

শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান প্রজন্মের মানুষ আত্মমর্যাদা এবং ব্যক্তিগত সুখকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে, ফলে সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসা সহজ হয়ে যাচ্ছে যদি তা তাদের সুখের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। উপন্যাসের চরিত্র সোহিনীর ছোটবেলা থেকেই শরীর নিয়ে কোনরূপ শুচিবায়ুগ্রস্থতা ছিল না। বিয়ের আগেই সে একাধিক পুরুষের সঙ্গে যৌনসঙ্গমে লিপ্ত ছিল। দুটো ছেলে-মেয়ের প্রেমে শরীর আসবেনা সেটা ভাবতেই পারেনা সোহিনী। বিশেষত ভার্জিনিটি তো তার কাছে আইডিয়া মাত্র। তাই যখন সে জানতে পারে তার স্বামী কমলের কাছে ভার্জিনিটি গুরুত্ব রাখে, সেদিনই সে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে দেওয়ার কথা ভেবেছিল। অন্যদিকে, তার পিসতুতো দিদি তৃণার বিয়ের চার মাসের মাথায় ডাইবোর্স ফাইল হয়। একসময় বিবাহকে সাত জন্মের বন্ধন বলে মানা হতো। এবং বিবাহবহির্ভুত যৌনসঙ্গম অবৈধ বলে স্বীকৃত ছিল একইসঙ্গে ব্যভিচার হিসাবে অভিহিত একটি পাপ ও অপরাধ। উপন্যাসে সোহিনী ও তৃণার মধ্য দিয়ে সেই চেনা-পরিচিত ছক ভাঙতে দেখা যাচ্ছে।

আবার,অর্থনীতি কিভাবে দাম্পত্য সম্পর্কে প্রভাব ফেলছে তা দেখা যাচ্ছে ‘কড়িখেলা’ উপন্যাসের মহুল-সোহিনীর কথোপকথন অংশে —

> “মহুল সোহিনীকে জিজ্ঞেস করল, ‘তোর বর কি করে?’ সোহিনী বলল, ‘ডাক্তার, এম ডি।...সে একটা মায়ের বুড়ো খোকা। ...কোন অ্যাম্বিশন নেই, পাড়ায় চেম্বার খুলে বসে আছে। ...শ্বশুরবাড়িতে আমি কমপ্লিটলি লেফট আউট। এক ঘরে। আমিও ওদের দেখতে পারিনা, ওরাও আমায় দেখতে পারে না।...বিয়েটা ভাঙবে একটা চাকরি পেলে।”[৫]

নারীত্বের সঙ্গে বরাবরই নম্রতা, মেনে নেওয়া বা মানিয়ে নেওয়াটা এক করে দেখা হয়। অতীতে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকায় অসুখী বিয়েতেও থেকে যেত মেয়েরা। যে কোন পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়া ব্যাপারটা ছিল তাদের মধ্যে। এমনকি শারীরিক, মানসিক অত্যাচার সয়েও বিয়ে ভাঙত না লোকলজ্জার ভয়ে। সেই প্রয়োজন আজ ফুরিয়েছে। উপন্যাসের সোহিনী তথাকথিত আধুনিক, স্বনির্ভর মেয়ে। প্রেমে বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পর সে যখন কমলকে বিয়ে করে তখন তাকে প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল। কিন্তু শুরু থেকেই বুঝতে পেরেছিল কমল একটা বর্ম পরে তার কাছে এসেছে। বিয়ের ঠিক এক দেড় মাসের মাথায় একটা অবোধ ঝগড়াঝাঁটির পর সোহিনী যখন হুহু কান্নায় ভেঙে পড়ে কমলকে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করেছে তখন হঠাৎ কমল তাকে বলেছিল সে তার জীবনে প্রথম পুরুষ নয়। এবং সোহিনী যখন জানতে পারে কমলের কাছে তথাকথিত শারীরিক পবিত্রতা গুরুত্ব রাখে তখনই আহত হয় সে। কমলের সঙ্গে তার শারীরিক সম্পর্কও সুখের ছিল না। সোহিনীর কাছে তাই কমলের পরিচয় ‘মায়ের ভেড়ুয়া ছেলে’, ‘মায়ের বুড়ো খোকা’। অন্যদিকে, স্বাধীনচেতা সোহিনীর শাশুড়িরও তাকে পছন্দ ছিল না, যদিও শাশুড়িকেও সোহিনীর অপছন্দ করে। চাকরিটা হয়ে গেলেই আর এই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে না সে। সব মিলিয়ে একক কেন্দ্রিক মানসিকতায় পুষ্ট সোহিনী চরিত্রের উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে বাঁধাধরা ছক ভাঙতে দেখা যাচ্ছে । আজকের সোহিনীরা আর আগের মতন মেনে নেওয়া বা মানিয়ে নেওয়ার মধ্যে আটকে নেই। পায়ের তলায় উপার্জনের জমি এবং স্ব-চেতনা সোহিনীদের শেখাচ্ছে স্বাবলম্বী হয়ে একাও বাঁচা যায়।

২) নির্বাচিত উপন্যাসে বিশ্বায়নের খাদ্য সংস্কৃতি ও নারী: বিশ্বায়নের ফলে পুঁজি বিনিয়োগকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি বৈশ্বিক খাদ্যের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হওয়ার কারণে স্থানীয় সংস্কৃতি পাল্টে যাচ্ছে। বহুজাতিক ফাস্টফুড চেইনগুলো দ্রুত গোটা বিশ্বজুড়ে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ করছে, পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন-নতুন বাজারে প্রবেশ করছে এবং স্থানীয় খাদ্য সংস্কৃতিকে প্রতিস্থাপন করছে। বিভিন্ন দেশের খাবার এখন সব জায়গায় সহজলভ্য। পশ্চিমা খাবার আজ বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসের চরিত্র শর্মিলার ভাষায় -

> “এই আঠাশ তলার বিল্ডিংয়ে কার ফ্ল্যাট থেকে নিম-বেগুন ভাজার গন্ধ ভেসে আসছে? এখানে তো বাঙালি প্রায় নেই বললেই চলে।...আর থাকলেও এত ভোরে ওট- মিল্ক, কর্নফ্লেক্স দিয়ে ব্রেকফাস্ট করার বদলে কে নিম-বেগুন খাবে? এই কমপ্লেক্সের বাঙালিদের লাইফস্টাইল তো আন্তর্জাতিক মানের। গন্ধটা তাকে পাগল করে দিচ্ছিল! ইচ্ছে করছিল, গরম ভাত নিয়ে তাতে নিম-বেগুন ভাজা মেখে খায়।”[৬]

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সকালের খাবার হিসেবে আমাদের প্রচলিত অভ্যাস বদলে গেছে, এর জায়গা জুড়ে আছে পশ্চিমা সংস্কৃতির অন্তর্গত রেডিমেড খাবার। ফাস্টফুড সহজলভ্য হওয়ার কারণে মানুষ রান্নার ঝামেলা এড়িয়ে এ ধরনের খাবার বেছে নিচ্ছে। অথচ উপন্যাসের চরিত্র শর্মিলার আবেগ-অনুভূতির সঙ্গে এখনো জড়িয়ে আছে তার পুরনো অভ্যাস হাতে তৈরি খাবার ‘নিম বেগুন ভাজা’।

আবার, এগারো বছরের মেয়ে বাঁধুলী চরিত্র উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে দেখা যায় —

> “বাঁধুলি একদম উল্টো…বাড়িতেও কাঁটা চামচে খায়, ভাত-ডাল মুখে রোচেনা, সারাক্ষণ পিৎজা আর বিদেশি ফুড জয়েন্টের স্যান্ডউইচ - সালাডের জন্য বায়না।”[৭]

বাঙালির প্রচলিত খাদ্যাভ্যাস হিসাবে যে হাত দিয়ে খাওয়ার অভ্যাস, সেটা প্রতিস্থাপন করছে পশ্চিমা সংস্কৃতির অন্তর্গত ‘কাঁটা চামচে খাওয়া’। কাঁটা চামচের ব্যবহার বৃদ্ধির সম্ভবত দুটো কারণ — এক, হাইজিন বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং দুই, ঠাণ্ডার সময় বারবার হাত ধোয়ার ঝামেলা কমায়। তবে এতে অনেক ক্ষেত্রে খাবারের আসল স্বাদ ও অভিজ্ঞতা কমে যেতে পারে। অন্যদিকে বাঙালি খাবার হিসেবে আগে যেভাবে ভাত-ডাল ও প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া হতো তার বদলে আন্তর্জাতিক প্রচারের মধ্য দিয়ে ফুড চেইন হিসেবে পিৎজা, স্যান্ডউইচ ইত্যাদি খাদ্যাভ্যাসে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এতে সাধারণত উচ্চ ক্যালোরি, চিনি ও সোডিয়াম এর পরিমাণ বেশি থাকে যা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক।

বিশ্বায়নের ফলে পশ্চিমা সংস্কৃতি ও জীবনধারা আমাদের সংস্কৃতিতে কিভাবে মিলে যাচ্ছে এবং আমরা তা গ্রহণ করছি তার উদাহরণ হিসেবে নিচের উদ্ধৃতিটি তুলে যেতে পারে —

> “আয়েষার বাড়ির তিনতলায় মাঝে-মাঝে ছোট্ট একটা মদ্যপানের আসর বসে। সেখানে মধ্যমণি আয়েশা স্বয়ং।…তিনতলায় একটা বসার ঘর আছে, সেখানে সোফা-টোফা পাতা, মেঝেতেও গদি পেতে তাকিয়া টাকিয়া দেওয়া আছে, একটা টিভিও আছে বিয়াল্লিশ ইঞ্চির আর শোকেস ভর্তি মদের বোতল, মদের আসর ওখানেই বসায় অভীক। আয়েষাও।”[৮]

একসময় যে মদ্যপানকে গোপনীয় এবং লজ্জাজনক একটি কাজ হিসেবে দেখা হতো,এখন তা সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে, বিশেষত শহরাঞ্চলে। উপন্যাসে দেখা যাচ্ছে, আয়েশার বাড়ির ভেতরেই, খোলামেলাভাবে মদ্যপানের সুবন্দোবস্ত রয়েছে। শোকেস ভর্তি মদের বোতল এমনকি স্বামী স্ত্রী একসঙ্গেই মদ্যপানের আসর বসায়। আসলে, টিভি শো এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় মদ্যপানকে একটি স্বাভাবিক ও আকর্ষণীয় কাজ হিসেবে প্রদর্শন করা হচ্ছে যা আমাদের উদ্বুদ্ধ করছে। আবার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পানীয় ব্র্যান্ড বিজ্ঞাপন ও বিপণন কৌশল অবলম্বন করার মাধ্যমে মদ্যপানকে জনপ্রিয় করে তুলছে এবং আমাদের মদ্যপানে উৎসাহিত করছে।

৪) নির্বাচিত উপন্যাসে সৌন্দর্যের নতুন নির্মাণ ও নারী: বিশ্বায়নের বিকাশের অন্যতম কারণ মিডিয়া। বিশ্বায়নের ফলে মিডিয়া ও বিনোদন জগতে সৌন্দর্যের একটি বৈশ্বিক মান তৈরি হয়েছে। সৌন্দর্যের ধারণা এখন আর একক মানদন্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, মিডিয়া এবং ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি সৌন্দর্যের নতুন মানদন্ড তৈরি করতে সাহায্য করছে। অন্যদিকে গ্লোবাল ফ্যাশন ট্র্যান্ডগুলো স্থানীয় ফ্যাশনের উপর প্রভাব ফেলছে। আন্তর্জাতিক সৌন্দর্যপণ্য ও কসমেটিক্স ব্র্যান্ডগুলো সহজলভ্য হয়ে উঠেছে যা সৌন্দর্যচর্চার পরিচিত অভ্যাসে পরিবর্তন এনেছে। আমরা আজকাল পশ্চিমা সংস্কৃতিকে অনুকরণ করে বিভিন্ন ধরনের সৌন্দর্যপণ্য ব্যবহার করছি যা আগে আমাদের সংস্কৃতিতে ছিল না।

প্রসঙ্গত উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র আয়েষাকে আমরা দেখি-

“আজকাল আয়েষাদির খুব এসব কাণ্ডজ্ঞান হয়েছে, পাড়ার কেউ মারা গেলে সাদা সালোয়ার-কামিজ পড়ে শোকজ্ঞাপন করতে আসে…আয়েষা ঘোষ কি হিন্দি সিনেমার নায়িকা, যে কেউ মারা গেলে সাদা কলিদার

পরে, চোখে সানগ্লাস দিয়ে দেখা করতে আসতে হবে? এ পাড়ায় বহুৎ আলতু-ফালতু জিনিস আমদানি করেছে আয়েষাদি।”[৯]

সাধারণভাবে বাঙালি সমাজে শোকজ্ঞাপনের যে রীতি তার থেকে উপন্যাসের আয়েষার শোকজ্ঞাপন-রীতি ভিন্ন। বস্তুত, বলিউডের জগতে কেউ মারা গেলে সাদা পোশাক পরে, চোখে কালো সানগ্লাস পরে শোকজ্ঞাপন করতে যায়। আজ বিশ্বায়িত পৃথিবীতে সিনেমার রুপালি পর্দায় যা দেখানো হচ্ছে সেটাকেই আমরা নিজের জীবনে প্রতিফলন করার চেষ্টা করছি। নিচের কয়েকটি উদাহরণের মধ্য দিয়ে তা বিশদ করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

আবার,

> “এগারো বছরের বাঁধুলি শর্টস আর গেঞ্জি ছাড়া কিছু পরবেনা। সালোয়ার-কামিজ? “মা গো, তুমি পরো। ওসব জরি- চুমকি তুমি পরো। পাথর সেটিং গয়না তুমি পরো না, তুমি পরো। প্লিজ ডোন্ট আস্ক মি টু ড্রেস আপ লাইক আ ক্লাউন।”[১০]

বিশ্বায়িত পৃথিবীতে মানুষ যে টিভি, মিডিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের ফ্যাশন ও সৌন্দর্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের জীবনধারা অনুসরণ করছে তারই উদাহরণ এগারো বছরের মেয়ে বাঁধুলি। পশ্চিমা সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান আধিপত্য ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করছে আমাদের চিরায়ত সংস্কৃতির উপর। ভারতীয় পোশাক হিসেবে সমাজে আমরা এতদিন শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ পড়ে অভ্যস্ত ছিলাম, আজ বিদেশী পোশাকগুলো সহজলভ্যতার কারণেই হোক কিংবা অনুপ্রাণিত হয়েই হোক, আমাদের কাছে মুখ্য এবং একমাত্র পোশাক হিসাবে গণ্য হচ্ছে।

৫) নির্বাচিত উপন্যাসে নারী মূল্যবোধের পরিবর্তন ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের প্রকাশ: বিশ্বায়িত পৃথিবী একদিকে যেমন নারীর আত্মসত্তা ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্রের দ্বার উন্মোচন করছে, পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবে মেয়েদের শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং তারা নিজেদের অধিকার ও সুযোগ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে ওঠে। অন্যদিকে তাদের আবেগ-অনুভূতির জায়গাগুলো সূক্ষ্মতা যেন হারিয়ে ফেলে। এক্ষেত্রে আমরা উপন্যাসের সোহিনী চরিত্রের একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরতে পারি –

> ‘‘উল্টোদিকের বাড়িতে একজন মারা গেছে, তার বডি এখনো পাড়া থেকে বেরোতে পারল না। কমলের বউ তারই মধ্যে এত মাঞ্জা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল? মেয়েটার কি কোনও চক্ষু-লজ্জা নেই?...আরে এটা তো সাউথ ক্যালকাটা নয়, এখানে পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে লোকের জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক, এই বউটা সেসব তো মানতেই চায় না।’ ‘এসব মেয়ে এরকমই! কোনও নিয়ম-কানুন মাননেওয়ালি থোড়ি!”[১২]

আসলে, আমাদের আবেগ-অনুভূতিগুলো তৈরি হয় পরিবেশ- পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। একসময় আমাদের ‘পাড়া’ সংস্কৃতি ছিল যেখান থেকে পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে পারস্পরিক গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সামাজিক কাঠামো এবং মানুষের জীবনধারার অনেক বদল ঘটেছে। পাড়া সংস্কৃতিতে যে পারস্পরিক সম্পর্ক, সহযোগিতা, এবং আত্মিক বন্ধন ছিল, তা ফ্ল্যাট কালচারে অনেকটাই কমে গেছে। ইঁদুর দৌড়ে নিজেকে সামিল করে মানুষের মধ্যে সেই আন্তরিকতা এবং ঘনিষ্ঠতা অনেকটা

হারিয়ে যাচ্ছে। বেশিরভাগ মানুষ তাদের ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, ফলে পারস্পরিক সম্পর্কগুলো ক্ষীণ হয়ে পড়ছে।

মেয়েদের যৌন ইচ্ছা প্রকাশের সঙ্গে সম্পৃক্ত উপন্যাস থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরা গেল –

> "প্রতিবারই মিলনের পর সে অতৃপ্ত অবস্থায় ঘুমোতে যায়। প্রতিবারই তার মনে হয়, কমলকে যদি একটিবারও জাগাতে পারত। একটা বারও যদি শিকারি নেকড়ের মতো তার টুঁটি টিপে ধরত কমল, সে ওকে তাহলে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিত।....যতবার সে কমলকে চুমু খেতে চায়, কমল মাথাটা সরিয়ে নেয়, ঘাড় শক্ত করে রাখে। সোহিনীর মনে হয় ঘুষি মেরে ওর চোয়াল খুলে দেয় তখন। মায়ের ভেড়ুয়া ছেলের আবার এত শক্ত ঘাড় কি?"[১৩]

আগে মেয়েরা নিজেদের যৌন ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করতে পারত না। উপন্যাস অবলম্বনে দেখা যাচ্ছে এখন মেয়েরা শুধুমাত্র তাদের যৌন ইচ্ছা প্রকাশই করছে না, তারা রীতিমত ছেলেদের উদ্বুদ্ধ করতেও দ্বিধাবোধ করেনা বা পিছপা হয়না। মেয়েদের মধ্যে এই লজ্জা বা সংকীর্ণতার বোধ কমে যাচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তি নির্বিশেষে তাদের অনুভূতি এবং ইচ্ছা স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হচ্ছে। এই সামাজিক পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে শিক্ষার প্রসার, লিঙ্গ সমতা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, এবং সামাজিক মানসিকতার পরিবর্তন বিশ্বায়নেরই দান।

আলোচনা শেষে দেখা যায়, সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কড়িখেলা' উপন্যাসে বিশ্বায়নের ফলে যাপনের পরিবর্তনগুলো যেমন খাদ্য সংস্কৃতির পরিবর্তন, নারী পরিসর থেকে সৌন্দর্যের নতুন নির্মাণ, নারী মূল্যবোধ এর পরিবর্তন ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের প্রকাশ, ইত্যাদি নানাভাবে উঠে আসছে এবং এই পরিবর্তনগুলো বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে নিঃসন্দেহে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র:

১. সরকার, শান্তনু, 'বিশ্বায়ন লোকসংস্কৃতি ও প্রতিরোধের সন্দর্ভ', দাস, বেলা . চৌধুরী, বিশ্বতোষ) , 'বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি', অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০১৩,পৃ - ৫০
২. বন্দোপাধ্যায়, সুমহান, 'বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি' (দাস, বেলা . চৌধুরী, বিশ্বতোষ), 'বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি', অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০১৩, পৃ-৭৯-৮০
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতা, 'কড়িখেলা', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৪, পৃ- ৯
৪. তদেব, পৃ- ১৫
৫. তদেব, পৃ- ৩২
৬. তদেব, পৃ- ৫-৬
৮. তদেব, পৃ- ১৮
৯. তদেব, পৃ- ১৭-১৮
১০. তদেব, পৃ- ৩
১২.তদেব, পৃ- ৮
১৩.তদেব, পৃ- ১৩